পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যু

তোপের মুখে ইরান

হাসান মূর্তাজা

ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যুটি আকস্মিক বাঁক নিয়েছে। জার্মানির নয়া চ্যান্সেলর এ্যাঙ্গেলা মার্কেল প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে ইস্যুটিকে বাতাসে ভাসিয়েছেন আরেকবার। প্রেসিডেন্ট বুশও তক্কেতক্কে ছিলেন। দক্ষ ফিল্ডারের মতো ইস্যুটি লুফে নিয়ে বলেছেন, ইরানকে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটাই একমাত্র 'যৌক্তিক' পদক্ষেপ। অন্যদিকে মোল্লা শাসিত ইরানের সাফ জবাব, বিষয়টি জাতিসংঘে উঠলে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার তাৎক্ষণিক ইতি ঘটবে। তেহরান পুনরায় ফিরে যাবে আপাত স্থগিত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচিতে।

তেহরানের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সাপে-নেউলে সম্পর্কের কথা বাচ্চা ছেলেটারও জানা। ১৯৭৯-র ইসলামী বিপ্লবের পর থেকেই আমেরিকা সুযোগ খুঁজছে ইরানকে মোক্ষম ছোবল দেয়ার। সর্বশেষ, ২০০২ সালে ইরানকে 'শয়তানের অক্ষত্রয়ী'র একটি ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই পর্যবেক্ষকদের কপালে ভাঁজ। 'অক্ষত্রয়ী'র এক দেশ ইরাক বুশের করতলগত। কাজে কাজেই এবার ইরানের পালা।

পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষেত্রে ইরান কতদূর এগিয়েছে সেটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। ইংল্যান্ডভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এ মুহূর্তে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম শুরু করলে ২০০৯ সাল নাগাদ ইরান পরমাণু বোমার মালিক বনে যাবে। অন্যদিকে তেহরানের নেতৃবৃন্দ ক্রমাগত বলে আসছে, বোমা বানানোর কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। গত বছর নবেম্বরে এক জুমার খুৎবায় দেশটির প্রধান আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, ইসলাম ধর্মে পারমাণবিক বোমা তৈরি এবং মজুদের কোনো বিধান নেই। এবং ঈমানদার জাতি হিসেবে ইরানিরা বোমা তৈরির জন্য লালায়িত নয়। কিন্তু বুশ-ব্লেয়ারকে কে বোঝাবে ধর্মের কথা!

ইরান প্রশ্নে আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে দূরত্বটা প্রায় আটলান্টিকের সমান। ইউরোপ বিশেষত জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড চায় কূটনীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে। পেছনের কারণটা অবশ্য বোধগম্য। ইরানের বিপুল তেল এবং গ্যাস সম্পদের প্রতি অপার লোভ ইউরোপীয়ানদের। ইতিমধ্যে রয়েল ডাচ শেল, ইএলএফ, টোটাল এসএ, বিজি (ব্রিটিশ গ্যাস), মনুমেন্টের মতো ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো ইরানে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। সর্বশেষ এসেছে চীন। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী লি ঝাওজিয়াং ইরান সফরে এসে তেল-গ্যাস চুক্তি করেছে। কাজেই বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে ইউরোপীয় দেশগুলো ইরানের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ ভিন্ন। ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যই হলো গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো। যেমন- ইরানের আজাদেগান তেলক্ষেত্র উন্নয়নে ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল জাপান। কিন্তু মার্কিন চাপে চুক্তিভঙ্গ করতে বাধ্য হয় টোকিও। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ইরানকে পাকে ফেলতে চেয়েছে। আলোচনার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগই মার্কিন ব্রাত্য। মার্কিন নীতিনির্ধারকরা এমনকি আলোচনার মধ্যেও শক্তি প্রয়োগই খুঁজে পান। হেনরি কিসিঞ্জারের যেমন অভিমত, 'No matter how elegantly phrased, diplomacy by its very nature implies an element of and capacity for pressure' (অর্থাৎ যত মুখরোচকভাবেই বলা হোক না কেন, কূটনীতিতে স্বভাবগতভাবেই বলপ্রয়োগ বোঝায়)। কিসিঞ্জার আরো মনে করেন, ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে বিতর্ক হবে শক্তি প্রয়োগের সংজ্ঞা, সময়সূচি এবং প্রক্রিয়া নিয়ে, শক্তি প্রয়োগ হবে কি হবে না সেটা নিয়ে নয়।

এ ছাড়া কিসিঞ্জার প্রশ্ন তুলেছেন, এতো তেল-গ্যাস থাকতে ইরানের পারমাণবিক জ্বালানির কি প্রয়োজন? কিসিঞ্জারের ভাষ্যমতে, এ নিছকই দৃষ্টি ঘোরানোর ফন্দি। উত্তরটা অবশ্য পাওয়া যাবে দিলীপ হিরোর কাছে। দিলীপ হিরো লন্ডনভিত্তিক ইরান বিষয়ক বিশ্লেষক। হিরোর অভিমত, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্যাস এবং তেল রিজার্ভ থাকার পরও রাশিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে ইরানের সমস্যা কোথায়? প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু একদিন ফুরিয়ে যাবে, কাজেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনই লাভজনক। তাছাড়া রাশিয়া দুনিয়া জুড়ে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রি করে বেড়ায়। ইরান নিশ্চয়ই সেই পথে হাঁটবে না। তাছাড়া দিলীপ হিরো আরেকটি যুক্তি দেখিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, ইরানের আশপাশে প্রায় সবই (ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, ইসরায়েল) পারমাণবিক শক্তিধর। আঞ্চলিকতা একটা বড় চাপ।

পারমাণবিক জ্বালানি নিয়ে ইরানের উৎসাহ অবশ্য আজকে নতুন নয়। ১৯৭৮ সাল থেকেই অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লবের আগেই ইরানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু করে। সে সময় ইরান 'ইউরোডিফ' নামে একটি কোম্পানির অংশীদার। কোম্পানিটি গ্যাবন থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে ফ্রান্স, স্পেন এবং ইরানে সমৃদ্ধ করত। ইরান যদিও এনপিটিতে (পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ

ভারত

রাজনাথের বিজেপি

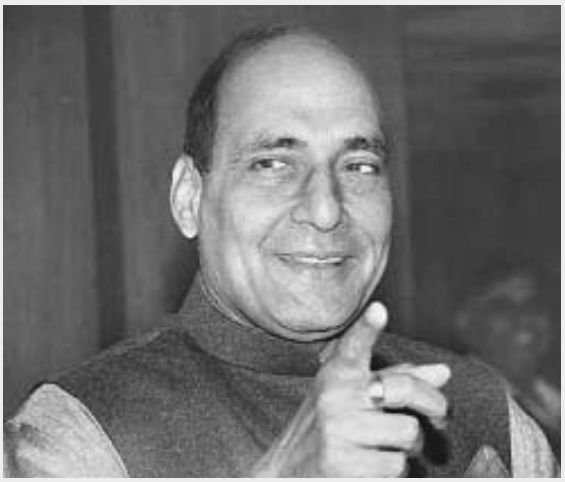

বিজেপিতে নেতৃত্ব বদল হয়েছে। কিন্তু আদর্শ বদলায়নি। নতুন নেতা কী নতুন কিছু দিতে পারবেন? লিখেছেন- জামান আরশাদ

একটি রাজনৈতিক দলের কিছু আদর্শ থাকে। গণতান্ত্রিক না সমাজতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক নীতি- এসব ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে চলবে, কোন নীতি গ্রহণ করবে, তা তাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকে এবং সেভাবেই দলটি পরিচালিত হয়।

সে দিক থেকে বলতে গেলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক দল বলা যাবে না। এটি আসলে হিন্দু কট্টরপন্থিদের একটি সংগঠন। ধর্মই এই দলের রাজনৈতিক ভিত্তি। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ বিষয়ে এই দলটি আলাদা কোনো অবস্থান নেই। বরং তারা সমাজের প্রতিটি স্তরে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি, যাকে বলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সেই আদর্শে বিশ্বাসী।

দলটির বয়স হয়েছে সিকি শতাব্দী। এতদিন বিজেপি বললেই দুই প্রবীণ বা দুই বন্ধু অটল বিহারি বাজপেয়ি ও লালকৃষ্ণ আদভানির নাম আসতো। এই দু'জন আবার ছিলেন দুই রকম। বাজপেয়ি মাঝে মধ্যে কট্টর হিন্দু আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলতেন। আর তাকে থামিয়ে আদভানি হিন্দুদের পথেই চলতে চাইতেন।

এই নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে দুই রকম ধারণা দেখা গেছে। একপক্ষ মনে করেছেন, প্রকৃতপক্ষে বিজেপির মতো একটা সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যে একমাত্র আলোর মানুষ হলেন বাজপেয়ি। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, উদার, বাস্তব অবস্থা বুঝতে সক্ষম। আবার অনেকে বলেন, এসব ছিল আসলে বাজপেয়ির ভান। তিনি ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বদলে ফেলতেন। এ জন্য তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন হতো না।

আর অধ্যাপক লালকৃষ্ণ আদভানি ছিলেন প্রকৃত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক। মনে-প্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন বাবরি মসজিদের স্থলেই ছিল রাম জন্মভূমি। তিনি চাইতেন হিন্দুধর্ম চর্চা ছড়িয়ে পড়ুক ভারতের প্রতিটি কোণে।

এই কট্টরপন্থি নেতার একদিন ঘুম ভাঙল। সোজা কথায় জীবন ও 'রাজনীতি'র প্রান্তসীমায় এসে তিনি উপলব্ধি করলেন, এতদিন যা নিয়ে চলেছেন, তার মধ্যে বিস্তর গলদ রয়ে গেছে। এখন অন্তত এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান সফরে গিয়ে তার পরিবর্তিত মানসকিতার প্রকাশ ঘটলো। বললেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না। তার এ মন্তব্যে তেড়ে ফুঁড়ে উঠলো নিজ দলের নেতাকর্মীরা।

বিজেপি দলটি আসলে নিজে নিজে পরিচালিত হয় না। তাকে পরিচালিত করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আরএসএস নামে একটি মৌলবাদী সংগঠন। শেষ পর্যন্ত আরএসএসের তোপের মুখে কোণঠাসা হয়ে পড়েন আদভানি। মাঝে মদল লাল খোরানার বহিষ্কার নিয়ে বাজপেয়ি-আদভানির মধ্যেও সম্পর্কের অবনতি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রধান দুই নেতাই দল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

আসলে তারা দুজন ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। ছায়া দিয়ে দলটিকে আগলে রাখতেন। তারা চলে যাওয়ায় মাথার ওপর থেকে ছাতাটা সরে যায়।

অনেক হিসাব-নিকাশ করে বিজেপির মাথায় ছাতা ধরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের ওপর। হিন্দু গোঁড়ামি দিয়ে সংঘ পরিবারকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন বলেই তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পঞ্চাশোর্ধ এই নেতা উত্তর প্রদেশের পাঠ্য বইয়ে ইতিহাস বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত।

এই মুহূর্তে বিজেপি ভালো অবস্থায় নেই। এককালের জ্বালাময়ী ভাষণের জন্য সুপরিচিত নেত্রী উমা ভারতী দলে নেই। মধ্যপ্রদেশে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আলাদা দল গঠন করলে বিজেপি ধাক্কা খাবে নিশ্চিত।

এর ভেতর ঘুষ কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন তাদের ১১ সাংসদ। পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলার জন্য তারা ঘুষ নেন। তাদের ঘুষ গ্রহণের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করেন সাংবাদিক অনিরুদ্ধ বহেল ও তার দল। এমন রাজনৈতিক আঘাত অতীতে আর কোনো দল এভাবে খায়নি। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রাজনীতিতে এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারি। একই সময়ে আরেক বিজেপি নেতার যৌন কেলেঙ্কারির ভিডিও প্রকাশ করা হয়। সেই নেতাকেও বহিষ্কার করতে দল বাধ্য হয়। আবার ওই নেতা ছিলেন চিরকুমার!

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে বিজেপির অবস্থা এই মুহূর্তে শোচনীয়। আর এই মেরুদন্ডহীন একটি দলের নেতৃত্বে এসে রাজনাথ সিং কী-ই বা করতে পারবেন! আসলে যে সাম্প্রদায়িকতা আর বাবরি মসজিদ ইস্যুতে দলটি বেলুনের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সেই অবস্থা এখন আর নেই। যেকোনো মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে যাবে, সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, নিকট ভবিষ্যতে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেই বিজেপি কিছুটা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে পারবে। কিংবা দেশের বা উপমহাদেশের কোনো স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত হলেই কেবল বিজেপি তা থেকে লাভের ফসল ঘরে তুলতে পারবে। তা না হলে নয়। তাই নেতৃত্বে রাজনাথ আসলেন, নাকি জর্জ ফার্নান্দেজ বা সুষমা স্বরাজ এলেন, নাকি সুদর্শন এলেন সেটা একেবারে জরুরি বিষয় নয়।

আর রাজনাথের কাছে বাড়তি কিছু আশা করার সুযোগ একদমই নেই, কারণ তিনি পশ্চাৎমুখী, রক্ষণশীল হিন্দু গোঁড়ামিতে জড়ানো এক নেতা।

জামান আরশাদ

চুক্তি) প্রথম স্বাক্ষরদানকারী ১১টি দেশের অন্যতম। সে সময় সদস্য দেশগুলো জানতো, তেহরান পরমাণু বোমা বানাতে চায়। কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে রেজা শাহের দোস্তি হেতু কারও কোনো আপত্তি ছিল না।

সমস্যা দেখা দিল ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর। পশ্চিমাদের ভয়, মোল্লারা পরমাণু অস্ত্রের মালিক হয়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনীদের আধিপত্য খর্ব হবে। পশ্চিমের বৈরী কোনো দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্রে চলে যাক তা আর যে-ই হোক, আমেরিকা চায় না।

তার মানে কি যুদ্ধ অত্যাসন্ন? বিশ্লেষকদের অভিমত, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের এখন লেজেগোবরে অবস্থা। এ মুহূর্তে আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি বুশ নেবেন না। তাছাড়া ইরানের হুমকি যত বাস্তবই হোক, মার্কিন জনগণকে তা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। সায় মিলবে না জনগণের। তাই বুশ চান জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরানের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের। তাহলে বন্ধ হবে ইউরোপীয় বিনিয়োগ। দূরত্ব বাড়বে তেহরান ও ব্রাসেলসের। যুক্তরাষ্ট্র সেই সুযোগের অপেক্ষায়।